বিশ্বসেরাদের
সফলতার গল্প

শ্রাবণ আহমেদ

প্রথম প্রকাশ: বইমেলা-২০২৫

বৃত্ত
(একটি সৃজনশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

উৎসর্গ

এস এস সি ২০০০ ব্যাচের
সকল বন্ধুদের

ভূমিকা

"স্বপ্ন দেখা" মানুষকে জীবনের লক্ষ্য দিয়ে দেয়। –এই কথাটি কতটা সত্য, তা প্রমাণ করেছেন ইতিহাসের নানা যুগের মহান ব্যক্তিত্বরা। জগদীশচন্দ্র বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ক্রিস্টোফার কলম্বাস, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি, স্টিফেন হকিং, উইলিয়াম শেক্সপীয়র– এই নামগুলো শুনলেই আমাদের মনে জাগে এক অন্যরকম আগ্রহ। তারা ছিলেন সাধারণ মানুষ, কিন্তু তাদের স্বপ্ন ছিল অসাধারণ।

এই বইটি পড়ে জানা যাবে কীভাবে এই মহান ব্যক্তিত্বরা তাদের স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলেছিলেন। কীভাবে তারা সমাজের বাধা, ব্যক্তিগত সমস্যা, সীমাবদ্ধতাকে পেরিয়ে গিয়ে নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করেছিলেন। তাদের জীবনের সংগ্রাম, সাফল্য এবং ব্যর্থতা– সবকিছুই আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

এছাড়াও জানা যাবে কীভাবে জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত খুলেছিলেন, কীভাবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, কীভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, কলম্বাস কীভাবে নতুন দুনিয়া আবিষ্কার করেছিলেন, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি কীভাবে একজন বিশ্বকোষ ছিলেন, স্টিফেন হকিং কীভাবে মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন করেছিলেন, উইলিয়াম শেক্সপীয়র কীভাবে বিখ্যাত নাটকগুলো লিখেছিলেন– এই সবকিছুই জ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে।

মহান ব্যক্তিদের স্বপ্নপূরণের এই গল্পগুলো পড়লে বোঝা যাবে যে, স্বপ্ন দেখাটা খুবই সহজ, কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করা অনেক কঠিন। এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং একনিষ্ঠতা। আর এগুলোর সমন্বয় থাকলে যত অসাধ্য স্বপ্নই থাক না কেন, তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। শুধু নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে এবং কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

আমাদের মনেও হয়তো অনেক স্বপ্ন আছে। এই বইটি আমাদের স্বপ্ন পূরণের পথে অনুপ্রাণিত করবে। বিশ্বসেরাদের স্বপ্নপূরণের গল্পগুলো পড়ে অনুপ্রাণিত হওয়া যাবে যে, আমাদের মধ্যেও রয়েছে একজন মহান ব্যক্তিত্বের সব গুণ।

তাই দেরি না করে বইটি পড়া শুরু করে স্বপ্নপূরণের যাত্রা শুরু করা যাক।

"স্বপ্ন দেখো, কাজ করো এবং সফল হও।"

–শ্রাবণ আহম্মেদ

প্রকাশিত বই

১. তুমি সুখী হও।
২. কেন কাঁদালে আমায়।
৩. দুঃখই আমার জীবন সঙ্গী।
৪. একদিন খুঁজবে আমায়।
৫. তোমায় এক জনম ধরে ভালবাসলেও ভরবে না এ মন।
৬. পৃথিবীর শেষ বেলাতেও আমি তোমারই থাকব।
৭. হায়রে ভালবাসা।
৮. রুশ দেশের রুপকথার গল্প।
৯. খেলায় খেলায় বিজ্ঞান প্রজেক্ট।
১০. বিজ্ঞানের মজার প্রজেক্ট।

সূ চি প ত্র

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু	০৯
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৯
মধুকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৪৩
স্টিফেন হকিন্স	৫৭
ক্রিস্টোফার কলম্বাস	৬৭
উইলিয়াম শেক্সপীয়র	৭৯
লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি	৮৭

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কয়েকটি উক্তি

- বিদ্যা হলো সব থেকে বড় সম্পদ, বিদ্যা শুধু আমাদের নিজেদের উপকার করে না বরং প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে গোটা সমাজের কল্যাণ সাধন করে।
- সদা সত্য কথা কহিবে। যে সত্য কথা কহে সকলে তাহাকে ভালোবাসে।
- দুঃখ ছাড়া জীবন নাবিক ছাড়া নৌকার মতোন।
- যাহার যে অবস্থা, সে যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কাহারও নিকট অপদস্থ ও অপমানিত হইতে হয় না।
- যে ব্যক্তি শ্রমবিমুখ হইয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে তাহার চিরকাল দুঃখ ও চিরকাল অভাব থাকে।
- এই সংসারে দাম্পত্যনিবন্ধন সুখই সর্বাপেক্ষা প্রধান সুখ।
- পরিশ্রম না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুখলাভ হয় না। যে ব্যক্তি শ্রম করে সে কখনও কষ্ট পায় না।
- তোমার অবস্থা যত মন্দ হউক না কেন, অন্যের অবস্থা এত মন্দ আছে যে তাহার সহিত তুলনা করিলে, তোমা অবস্থা অনেক ভাল বোধ হইবেক।
- ফলবতী বৃক্ষ নত হয়, নত হয় গুণীজন, নত হয় না শুধু শুষ্ক বৃক্ষ আর মূর্খরা।

উইলিয়াম শেক্সপীয়রের কয়েকটি উক্তি

- কাউকে সারাজীবন কাছে পেতে চাও? তাহলে প্রেম দিয়ে নয় বন্ধুত্ব দিয়ে আগলে রাখো, কারণ প্রেম একদিন হারিয়ে যাবে কিন্তু বন্ধুত্ব কোনোদিন হারায় না।
- ভীরুরা মরার আগে বারেবারে মরে। সাহসীরা মৃত্যুর স্বাদ একবারই গ্রহণ করে।
- আমি সবসময় নিজেকে সুখী ভাবি, কারণ আমি কখনো কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করি না, কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করাটা সবসময়ই দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- প্রয়োজন খারাপকেও ভালো করে তোলে।
- সংসারে কারো ওপর ভরসা করো না, নিজের হাত এবং পায়ের ওপর ভরসা করতে শেখো।
- মনের সৌন্দর্য্যকে যে অগ্রাধিকার দেয় সংসারে সেই জয়লাভ করে।
- আমার ভালো বন্ধুদের কথা মনে করে আমি যতোটা সুখী হতে পারি, অন্য কোনোভাবে ততোটা সুখী হতে পারি না।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

জন্ম	: ৩০শে নভেম্বর, ১৮৫৮
জন্মস্থান	: বিক্রমপুর, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি (বর্তমানে মুন্সীগঞ্জ, বাংলাদেশ)
মৃত্যু	: ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭
মৃত্যুস্থান	: গিরিডি, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ব্রিটিশ ভারত (বর্তমানে গিরিডি, ঝাড়খণ্ড, ভারত)
বয়স	: ৭৮ বছর
জাতীয়তা	: ব্রিটিশ ভারতীয়
নাগরিকত্ব	: ব্রিটিশ ভারতীয় (জন্মসূত্রে)
মাতৃ শিক্ষায়তন	: ময়মনসিংহ জেলা স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ক্রাইস্ট কলেজ, কেমব্রিজ, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়
পরিচিতির কারণ	: মিলিমিটার তরঙ্গ, বেতার, ক্রেসকোগ্রাফ, উদ্ভিদবিজ্ঞান
দাম্পত্যসঙ্গী	: অবলা বসু
পুরস্কার	: সিআইই (১৯০৩), সিএসই (১৯১১), নাইট ব্যাচেলর (১৯১৭)
কর্মক্ষেত্র	: পদার্থবিজ্ঞান, জৈবপদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, সাহিত্য, বাংলা কল্পবিজ্ঞান
প্রতিষ্ঠানসমূহ	: ময়মনসিংহ জেলা স্কুল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়
উচ্চশিক্ষায়তনিক উপদেষ্টা	: জন উইলিয়াম স্ট্রাট
উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী	: সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, শিশির কুমার মিত্র, দেবেন্দ্র মোহন বসু

মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলায় অবস্থিত স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ি বাংলাদেশের অন্যতম একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এখানেই প্রখ্যাত বাঙালি উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর পৈতৃক বাড়ি। এটি শ্রীনগর উপজেলার রাঢ়ীখাল গ্রামে অবস্থিত। ঢাকা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিলোমিটার। কিন্তু মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার রাঢ়ীখালে পৈতৃক বাড়ি হলেও বাংলার এই কৃতীসন্তান ও বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম ১৮৫৯ সালের ৩০শে নভেম্বর পিতার কর্মস্থল ময়মনসিংহে হয়েছিল। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী– ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। পিতার কর্মস্থল ফরিদপুরেই প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শুরু হয় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর। তিনি একমাত্র বাঙালি বিজ্ঞানী, যিনি সাম্রাজ্যবাদী জাঁতাকলের চাপে পড়ে ন্যায্য পাওনা নোবেল পুরস্কার থেকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, মানুষের যেমন ভয়, ভালোবাসা, রাগ, দুঃখ থাকে, তেমনি উদ্ভিদেরও থাকে। তিনি বিশ্বাবাসীর সামনে প্রমাণ করে দেখাতে পেরেছিলেন যে, সত্যিকারভাবে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে।

ভারতবর্ষের কোনো বিজ্ঞানী যে এতবড় একটা আবিষ্কারের দাবিদার হতে পারে, সেটা তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী সরকার মেনে নিতে পারেননি। তাই সেদিন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কণ্ঠরুদ্ধ করেছিল তৎকালীন ইংরেজ সরকার। ভারতবর্ষে যারা বসবাস করেন, তারা যে মানুষ, এটা ইংরেজরা কখনও মেনে নিতে পারেননি। তারা মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি যে, জগদীশচন্দ্র বসুর মতো একজন মানুষ বিজ্ঞান সাধনার শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি পেতে পারে। তাঁদের অহংকার সেদিন জগদীশ বসুকে নোবেল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করেছিল। মনে পাহাড় সমান কষ্ট নিয়েও তিনি দমে যাননি। চালিয়ে গেছেন তাঁর আবিষ্কারের যুদ্ধ। আমরণ লড়াই চালিয়ে বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে গেছেন তাঁর আবিষ্কারের কথা।

জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর বাবাকে দেখেছেন একের পর এক নতুন নতুন প্রকল্প নিয়ে কাজ করছেন। এসব প্রকল্পের সমস্ত ব্যয় তিনি তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকেই ব্যয় করতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারতেন না। তবুও তিনি হাল ছেড়ে দিতেন না। শুরু করতেন নতুন নতুন প্রকল্প। কৃষি ব্যাংক, স্বদেশি চা বাগান, টেকনোলোজির স্কুল, শেষমেশ কোনোটাই টেকাতে পারেননি তিনি। এসব প্রকল্পে প্রচুর পরিমাণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন তিনি। বাবার এসব প্রকল্পের ব্যর্থতার চিত্র চোখের সামনেই দেখেছেন তিনি। আর এ থেকেই তিনি দেখেছেন যে, কীভাবে ব্যর্থ হতে হয়, আর কীভাবে ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে হয়। উত্থানপতনের এসব খেলা জগদীশচন্দ্র বসু পারিবারিকভাবেই চোখের সামনেই দেখেছেন। জন্ম থেকেই তিনি অনমনীয় দৃঢ়তার অধিকারী ছিলেন। কোনোকিছুতে দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না তিনি।

এভাবেই জগদীশচন্দ্রের জীবনে দিন যায় রাত আসে। জগদীশচন্দ্র বড় হতে থাকে। এতদিনে সবকিছুই ভালোভাবে বুঝতে শিখেছে। এরই মধ্যে তাঁর জীবনে নেমে আসে এক কালো মেঘ, উত্থানপতনের অধিকারী পিতার মৃত্যু। জগদীশচন্দ্র বসু দিনের পর দিন ব্যর্থতার দিকে এগিয়ে যাওয়া পিতার প্রকল্প নিয়ে আর এগোলেন না। কারণ বাবাকে দেখেছেন দিনের পর দিন ব্যর্থ হতে, এখন সেই ব্যবসায় হাত দিয়ে আর ব্যর্থ হতে চান না। অগত্যা তিনি চলে গেলেন বিলেত। সে সময় বিলেত যাওয়ার একমাত্র বাহন ছিল জাহাজ। অনেক দিন সমুদ্রে ভেসে তারপর পৌঁছাতে হতো গন্তব্যে। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বসু বিলেত যাওয়ার জন্য জাহাজে ওঠার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কালাজ্বরে আক্রান্ত হন তিনি। ভীষণ রকম জ্বর। দিনের বেশিরভাগ সময় বিছানায় নিথর হয়ে পড়ে

থাকতে হতো তাকে। সঙ্গীসাথিরা তো এক সময় তাঁর প্রাণের আশা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী জগদীশচন্দ্র বসু ইংল্যান্ডে পৌঁছানোর আগেই মোটামুটি সুস্থ হয়ে গেলেন।

ইংল্যান্ডে ডাক্তারি পড়া শুরু করলেন। কিন্তু অযাচিত এক বাধা তার সামনে এসে হাজির হলো। ডাক্তারি পড়তে হলে তো লাশ কাটা দেখতে হবে। তা না হলে তো ডাক্তারি পড়া হবে না। কিন্তু লাশের গন্ধ তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। লাশের গন্ধ নাকে আসলেই যেন শরীর গুলিয়ে উঠত। লাশের গন্ধে রাতের বেলায় জ্বর আসা শুরু করল। এবার আর ডাক্তারি পড়া হলো না। বড় ডাক্তার হওয়ার আশা ছেড়ে দিলেন। এবার শুরু হলো বিজ্ঞান নিয়ে পড়শোনা। দীর্ঘ চার বছর পর ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এলেন দেশে।

দেশে ফিরে এসেও দিশেহারা হয়ে যান। একদিকে প্রকল্পের ব্যবসা করতে যাওয়ায় বাবার ঋণের বোঝা। অন্যদিকে সংসার চালানো। অগত্যা চাকরির চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোথাও চাকরি জোগাড় করতে পারলেন না। তবুও হতাশ হলেন না। হাল না ছেড়ে চাকরির পেছনে ছুটতে ছুটতে এক সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা চাকরি মিলে গেল। চাকরিটা ছিল অস্থায়ী অধ্যাপকের পদ। অস্থায়ী হওয়ার কারণে অন্যান্য অধ্যাপকদের তিনভাগের দুই ভাগ বেতন পেতেন। এমন বৈষম্যের কারণে জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিবাদ করে বসলেন। কিন্তু এ প্রতিবাদ মেনে নিলেন না কর্তৃপক্ষ। ফলে জেদ করে জগদীশচন্দ্র বসু একটানা তিন বছর সম্পূর্ণ বিনা বেতনে চাকরি করলেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনোরকম সুযোগ সুবিধা তিনি নিলেন না। শুধু পড়িয়েই গেছেন। জগদীশচন্দ্রের এমন অনমনীয় দৃঢ়তার কাছে হেরে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এবার অস্থায়ী অধ্যাপকের পদটা পাকা হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ টানা তিন বছরের বেতনের সমপরিমাণ টাকা পরিশোধ করলেন। সেই টাকা দিয়ে বাবার রেখে যাওয়া ঋণ মিটিয়ে ফেললেন।

ব্রিটিশ সরকার জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণার কোনো কাজে কোনোরকম সাহায্য সহযোগিতা করেনি। ঈর্ষান্বিত হয়ে ব্রিটিশ সরকার গবেষণার জন্য তাঁকে দিয়েছিলেন তৃতীয় শ্রেণির একটি গবেষণাগার। সেখানে ছিল না কোনো সহকারী। যেখানে বিদেশে কোনো গবেষক গবেষণা করতে গেলে তাকে কয়েকজন সহকারী দেওয়া হতো। শুধু কি তাই, গবেষণারত অধ্যাপকদের সপ্তাহে মাত্র পাঁচ ছয় ঘণ্টার মতো পড়াতে হতো। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অসহযোগিতার কারণে জগদীশচন্দ্র বসুকে সপ্তাহে টানা ছাব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় পড়াতে হতো। এত

অসহযোগিতার মধ্যেও তিনি তাঁর গবেষণা চালিয়ে গেছেন। হাল ছাড়েননি তিনি। যখন জগদীশচন্দ্র বুঝতে পারলেন যে, ব্রিটিশ সরকার তাকে কোনোরকম সহযোগিতা করবে না, তখন তিনিই ব্যক্তিগতভাবে সবকিছুর ব্যবস্থা করে নিলেন। শুরু করলেন পরিচিত মিস্ত্রির খোঁজ। তাদের ডেকে বানিয়ে নিলেন প্রয়োজনীয় সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। তাই দিয়েই চলল তাঁর গবেষণা। মাত্র এক বছরের মধ্যেই পেলেন সফলতা। লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর গবেষণার ফলাফল। পেলেন ডিএসসি উপাধি ও বৃত্তি।

জগদীশচন্দ্র বসু তখন বিনা তারে শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে কীভাবে কথা বলা যায়, তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন। তখনকার দিনে এ খবরে সারা বিশ্বে হইচই পড়ে গিয়েছিল। বিশ্বের বড় বড় ব্যবসায়ী ও বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন এই বেতার ব্যবস্থাকে পুঁজি করেই কোটি কোটি টাকা ইনকাম করা সম্ভব। এক সময় জগদীশচন্দ্রের পেটেন্ট নেওয়ার জন্য বহু ব্যবসায়ীরা আসতে শুরু করল। কোটি কোটি টাকার প্রলোভন দেখানো হলো এই বিজ্ঞানীকে। কিন্তু তিনি ভাবলেন, অর্থের জন্য বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞান মানবসেবার জন্য। এমন প্রলোভনকে প্রশ্রয় না দিয়ে ব্যবসায়ীদের ফিরিয়ে দিলেন।

১৮৯৫ সাল। জগদীশচন্দ্র বসুর একটি স্মরণীয় বছর, যা তাঁর জীবনের গতিপথকে পাল্টে দিয়েছিল। নেহাত তরুণ এক বিজ্ঞানী প্রদর্শন করলেন এক ভৌতিক কাণ্ড। সেই বিচিত্র কাণ্ড দেখার জন্য সেদিন প্রদর্শনস্থলটি ছিল লোকে লোকারণ্য। তরুণ বিজ্ঞানী তাঁর সামনে বিচিত্র সব যন্ত্রপাতি নিয়ে ডায়াসে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। আর বক্তৃতা দিতে দিতেই ঘটিয়ে বসলেন তিনি সেই আশ্চর্য কাণ্ডটি। একটি পিস্তলের গুলির আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে পুরো পঁচাত্তর ফুট দূরে তালাবদ্ধ ঘরে রাখা একটি বারুদের স্তূপে ঘটে গেল বিস্ফোরণ। পিস্তলের সেই গুলির আওয়াজের সাথে বদ্ধঘরের বারুদস্তূপের কোনোই যোগাযোগ ছিল না। তাহলে ব্যাপারটা ঘটল কেমন করে? উপস্থিত সকলের তো দুচোখ ছানাবড়া। তাদের বিস্ময়ের সীমা নেই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেই তরুণ বিজ্ঞানী নিজেই বুঝিয়ে দিলেন আসল ব্যাপারটা কী ছিল!

বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়ানো তাঁর সামনে যে যন্ত্রটি রয়েছে, তার ভেতর থেকে বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েই ঘটিয়েছে এই কাণ্ড। আর এই অদ্ভুত ব্যাপারটার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বড়সড় একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল– বিনা তারে বার্তা প্রেরণের সূত্র। এই তত্ত্বের উদ্ভাবক বিজ্ঞানীই বাংলার গৌরব এবং শ্রেষ্ঠ বাঙালি বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। তিনিই সর্বপ্রথম বিনা তারে সংকেত আদান-

প্রদানের বৈজ্ঞানিক কৌশল উদ্ভাবন করেন। আর এর সাহায্যে তিনিই প্রথম দেড় কিলোমিটার দূর পর্যন্ত বিনা তারে বার্তা প্রেরণে সক্ষম হন। কিন্তু তৎকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে ও আর্থিক অনটনের কারণে জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর এই আবিষ্কারকে যথাসময়ে সহজে বিশ্ব জনসমক্ষে তুলে ধরতে সক্ষম হননি। অথচ অন্যদিকে ইতালির বিজ্ঞানী মার্কনি সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে বিনা তারে বার্তা প্রেরণে সক্ষম হন।

বিশ্বের বড় বড় বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, এবার বুঝি এমন দুর্লভ গবেষণার জন্য জগদীশচন্দ্রের নোবেল পুরস্কারের পথ সুগম হয়ে গেল। কিন্তু ভাগ্য এবারও সহায় হলো না। ব্রিটিশ সরকার সুইডেনের নোবেল কমিটির কাছে জগদীশচন্দ্রের নামই পাঠালেন না। কারণ একটাই, একজন বাঙালি বিজ্ঞানী এত বড় পুরস্কার পাবে, এটা তারা মানসিকভাবে মেনে নিতে পারলেন না। আর এই সুযোগেই আমেরিকার গুগলি এলসো মার্কনি বেতার আবিষ্কারের দাবিদার হিসেবে নোবেল পুরস্কার নিয়ে নিলেন। তবে বিশ্ববাসী স্বীকার করুক বা না করুক, জগদীশচন্দ্র বসুর কল্যাণেই তিনি সেদিন বেতারবার্তা আবিষ্কারের বিজয়মুকুট ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ সরকারের এমন বৈষম্যমূলক আচরণে ভেঙে পড়লেন না এই বাঙালি বিজ্ঞানী। নতুন উদ্যমে আবার কাজ শুরু করলেন। দ্বিতীয়বার বিদেশে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আসলেন বিজ্ঞান সাধনার পদ্ধতি। দেখলেন বিজ্ঞান সাধনার জন্য চাই উপযুক্ত গবেষণাগার। ব্রিটিশ সরকার এমন গবেষণাগার থেকে সারাজীবন তাকে সরিয়ে রেখেছেন। এবার নতুন গভর্নর লর্ড কার্জনের কাছে আবেদন জানালেন। তিনি জগদীশচন্দ্রের বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে জানালেন। অপেক্ষায় থাকলেন জগদীশচন্দ্র বসু। জগদীশচন্দ্র লর্ড কার্জনের কাছে বাঙালিদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদনে লিখেছিলেন, ভারতবর্ষে একটি আধুনিক মানের গবেষণাগার তৈরি করে দেওয়া হোক। যাতে সেখানে বাংলার প্রতিভাবান ছাত্ররা বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ পায়।

জগদীশচন্দ্র বসুর এমন আবেদনে লর্ড কার্জন চারজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর কাছে এই চিঠির ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে তাদের মতামত জানতে চাইলেন। এই চারজন বিজ্ঞানীর মধ্যে দুজনই ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসুর বন্ধু। তাঁরা ঠিকই সমর্থন করলেন, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ালেন বাকি দুজন বিজ্ঞানী। তারা লর্ড কার্জনের কাছে চিঠি লিখে জানালেন– 'জগদীশচন্দ্র বসু খুব বেশি উঁচুদরের বিজ্ঞানী নন। কাজেই তাঁর আবেদনের তেমন কোনো মূল্য নেই। তাছাড়া

ভারতের মতো অশিক্ষিতদের দেশে কেরানি বানানোর উপযোগী কয়েকটা স্কুল কলেজই যথেষ্ট। তাদের জন্য আবার গবেষণাগার তৈরি করে মহামান্য সরকারের অর্থের অপব্যয় করার কোনো মানেই হয় না।'

এমন খবরের কথা শুনে জগদীশচন্দ্র বসু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। ভাবতেও পারেননি এই দুজন বিজ্ঞানী এতে দ্বিমত পোষণ করবেন। বাঙালিকে এত ছোট করে দেখেন তারা। এদের এমন স্বার্থপর আচরণের কারণে এই মহান বিজ্ঞানীর মনের মধ্যে জেদ চেপে গেল। স্বপ্নের গবেষণাগার তিনি গড়ে তুলবেনই। ঠিকই জয় হলো ধৈর্য আর নিষ্ঠার। দীর্ঘ সতেরো বছরের হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে তিলতিল করে সঞ্চয় করা অর্থের বিনিময়ে তিনি গড়ে তুললেন স্বপ্নের বসু বিজ্ঞান মন্দির।

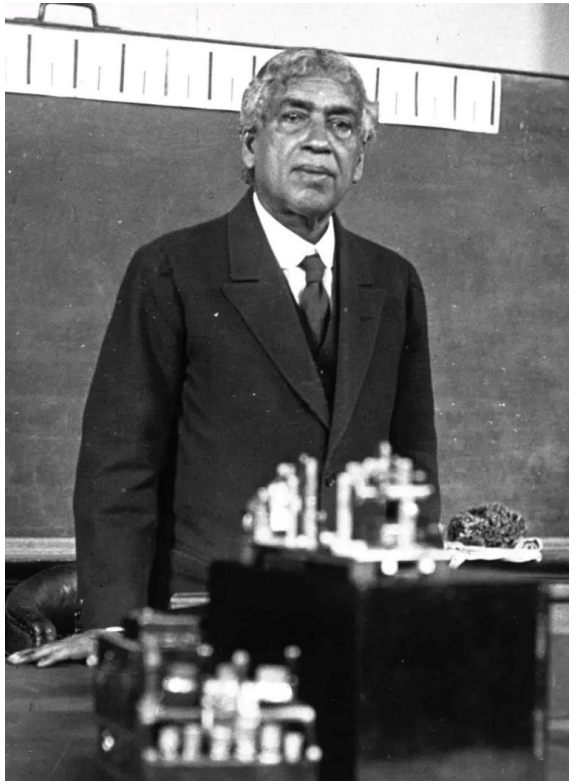

গাছের যে 'সংবেদনশীলতা' আছে এবং উত্তেজিত করলে গাছ যে সাড়া দেয়, তা নিয়ে ১৯২৬ সালে প্যারিসে বক্তৃতা দিচ্ছেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু।